যুগান্তর

তারিখ ...19 JAN 2017...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৪...

জয়া ফারহানা

ভাষার আবার জাত কী?

কখনও কি ভেবেছেন বছরভর অথবা বছরের পর বছর সম্পাদকীয় পাতায় এক নম্বর ইস্যু হয়ে থাকে কোনটি? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাই সেই ইস্যু, যা বছরের পর বছর এক নম্বর বিবেচনার বিষয় হয়ে ওঠে। তবে আপাতত সম্পাদকীয় পাতা জমে আছে পাঠ্যপুস্তক বিতর্ক নিয়ে (নাকি থিতিয়ে গেছে খানিকটা?)। না, 'ওড়না চাই' বাক্যে কন্যাশিশুর মনস্তত্ত্ব আহত হয় কিনা, শিশু বয়সেই সে নিজেকে সহপাঠীর সঙ্গে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ভেবে অসহায় অনুভব করে কিনা, 'রথ টানি' বা 'ঋষি ওই বসে আছে'র মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ছায়া আছে কিনা, ভুল বানান, ভুল বাক্য, বিকৃত বাক্য বা তথ্য এসব অমার্জনীয় কী মার্জনীয় অপরাধ, অজকে আমগাছে উঠানোর মধ্য দিয়ে কতখানি 'অজামি' হয়েছে, নাকি শিশুদের বিনোদিত করার জন্য ছাগলকে গাছে উঠানোর ছবি ছাপা হয়েছে, এসব তর্ক আজ নয়। বই তৈরির সঙ্গে বিতরণের মতো বাড়তি চাপ এনসিটিবির নেয়া উচিত কী উচিত নয়, ধনী-দরিদ্র সবাইকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা উচিত কিনা, পাঠ্যবইয়ের লেখক ও সম্পাদক নির্বাচনের মানদণ্ড ঠিক আছে কিনা, সে তর্কও নয়।

গত দু'সপ্তাহের সম্পাদকীয় পাতার বিতর্কে এসব নিয়ে আলাপ হয়েছে। সঙ্গত কারণে উঠে এসেছে আরও নানা প্রসঙ্গ। যেমন, নিষ্প্রাণ পাঠ্যবই এবং সে বইয়ের প্রাণহীন অসরস ভাষা, ভাষার বন্ধ্যত্ব, জড়তা ইত্যাদি। আলোচনা হয়েছে পাঠ্যবইয়ের ভাষা, ভাষার স্টাইল এবং ভাষার সংবেদনশীলতা নিয়ে। পাঠ্যপুস্তক লেখা, সম্পাদনা ও মুদ্রণের কাজে যে দায়িত্বজ্ঞানহীনদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল এবং তা যে দলীয়করণের জাজ্বল্যমান নমুনা জানা গেল, তাও। দলদাস এই অযোগ্যদের করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে চাকরি ছাড়ার পরামর্শ এসেছে। পাঠ্যপুস্তক বিতর্কের ক্যানভাসে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি, শিক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূল পরিবেশ, যোগ্য শিক্ষকের অভাব, প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম এবং নিয়োগ বাণিজ্যে মেধাবী পরীক্ষার্থী নিয়োগ না পাওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে। বিতর্ক মন্দ নয়। 'টেকেন ফর গ্র্যান্টেড' যে কোনো কিছুই একঘেয়ে ক্লান্তিকর।

তবে বিতর্ককে শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো মীমাংসার স্তরে পৌঁছাতে তো হয়। নয়তো বছরের পর বছর তর্ক চলতে থাকে। তাতে বিভাজন বাড়ে। মীমাংসার ধারা শক্তিশালী হওয়ার বদলে সমাজে বিভাজনের ধারা শক্তিশালী হয়। লক্ষ্য রাখা দরকার, পণ্ডিতজনের সব তর্ক-বিতর্ক যেন আমাদের সাধারণদের চিন্তাকে ধারালো করে, বুদ্ধিকে দায়িত্বশীল করে, বিভাজন না বাড়ায়। এক দেশ, এক ভাষা, এক মাটির বাংলাদেশের মানুষ যেন কোনো বিশেষ শিক্ষা, কোনো বিশেষ ভাষা বা কোনো বিশেষ মতাদর্শের প্রতি অসহিষ্ণু না হয়ে ওঠে, যেন বিশেষ রকম বিদ্বেষ পোষণ না করে। সংস্কৃত ভাষার শব্দ ঈশ্বর এবং আরবি ভাষার শব্দ আল্লাহ সবের প্রতি শিশু বয়স থেকে যেন শ্রদ্ধা তৈরি হয়। ভাষা অপরাধী নয়, কোনো ভাষার প্রতি বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। জানি এ নিরেট সরল বাক্য দিয়ে অতি জটিল পাঠ্যপুস্তক বিতর্কের সমাধান সম্ভব নয়। কেননা পাঠ্যপুস্তক বিতর্কের সঙ্গে আছে বিদ্বেষ কখন তৈরি হয় সেই প্রশ্ন, ভাষার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন, ধর্ম বিশ্বাস ও তার প্রকাশ, চিন্তার মাধ্যম ভাষা কিনা সে প্রশ্ন।

স্বীকার করি, পাঠ্যপুস্তক বিতর্কের প্রেক্ষাপট বিস্তর গোলমেলে; কিন্তু সেই গোলমাল মেটানোর সূত্র তো গোলমাল বাধিয়ে দেয়া হতে পারে না। গোলমাল মেটাতে চাই কিনা, গোলমাল মিটিয়ে আরও বৃহত্তর স্বার্থের ইস্যু সামনে আনতে চাই কিনা প্রশ্ন সেটাই। বৃহত্তর স্বার্থ মানে এখানে সংখ্যার বৃহত্তর স্বার্থ নয়। বৃহত্তর স্বার্থ অর্থ একজন কোনো ক্ষুদ্রাস্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিরাপত্তা থাকা। কোনো গোলমাল যদি একজন ব্যক্তিরও জীবনের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় সেটা বৃহত্তের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়া। কোনো কোনো চিন্তক আশংকা প্রকাশ করেছেন, শেখ হাসিনার বাংলাদেশে শেষ পর্যন্ত মূল ধারার শিক্ষা কওমি মাদ্রাসার আদলে ঢেলে সাজানো হবে কিনা। বিপরীত পক্ষ এ আশংকাকে চিহ্নিত করেছেন ঔপনিবেশিক শিক্ষার দাসত্বের দর্শন হিসেবে। প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা কি তবে কেবল অর্থকরী দক্ষতা অর্জনের উপায়? তা তো হওয়ার কথা নয়, শিক্ষার তো এর চেয়ে অধিকতর কিছু লক্ষ্য থাকার কথা। তা হতে পারেনি বলে মূলধারার শিক্ষা উৎপাদনের অধিকতর কিছু হয়ে উঠতে পারেনি। শিক্ষার মতো সবচেয়ে

> পাঠ্যপুস্তক বিতর্কের প্রেক্ষাপট বিস্তর গোলমেলে; কিন্তু সেই গোলমাল মেটানোর সূত্র তো গোলমাল বাধিয়ে দেয়া হতে পারে না, গোলমাল মেটাতে চাই কিনা, গোলমাল মিটিয়ে আরও বৃহত্তর স্বার্থের ইস্যু সামনে আনতে চাই কিনা প্রশ্ন সেটাই। বৃহত্তর স্বার্থ মানে এখানে সংখ্যার বৃহত্তর স্বার্থ নয়। বৃহত্তর স্বার্থ অর্থ একজন কোনো ক্ষুদ্রাস্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিরাপত্তা থাকা। কোনো গোলমাল যদি একজন ব্যক্তিরও জীবনের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় সেটা বৃহত্তের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়া।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে যুক্তদের মধ্যে সর্বোচ্চ যোগ্যদের পায়নি বাংলাদেশ। তাদের নৈতিক মান, সম্মানবোধ, আদর্শ এবং যোগ্যতা নিয়ে প্রবল প্রশ্ন আছে।

স্বীকার করি, শিক্ষার উপযোগিতা উৎপাদনের চেয়ে আরও অধিকতর উচ্চতায়; কিন্তু এ-ও তো ঠিক বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের বড় একটি অংশই আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হতে পারছেন না। বরং মাদ্রাসা থেকে যেসব শিক্ষার্থী পাস করে বেরিয়ে আসে তাদের খুবই ছোট্ট একটি অংশ মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, মাদ্রাসার শিক্ষক অথবা বাংলা মাধ্যমের স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে কাজ পান। বাকিরা আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও দার্শনিক শিক্ষায় মৌলিক গবেষক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারছেন না। মেকলে প্রযোজিত শিক্ষাব্যবস্থা উৎপাদন করছে হাস্যোজ্জ্বল দাস, আর মাদ্রাসা শিক্ষা যাদের উৎপাদন করছে তারাও কেউ আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং দার্শনিক শিক্ষার মৌলিক চিন্তক নন। আইন করে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের যুক্তি অচল মনে হবে, কেননা পাল্টা যুক্তি আসতে পারে যে, দেশে যদি মিশনারিদের পরিচালিত স্কুল-কলেজ চলতে পারে তবে ইসলামী শিক্ষা নয় কেন। কওমি বা ওহাবি মাদ্রাসায় এখন পর্যন্ত দেওবন্দদের পাঠ্যশালা অনুসরণ করা হয়। যতদূর জানি ওহাবি মাদ্রাসার সংখ্যাই বেশি। এ মাদ্রাসায় আরবি, ফার্সি এবং উর্দু ভাষা শেখানো হয়। ভাষা হিসেবে আরবি, ফার্সি এবং উর্দু সবক'টি ভাষা-ই তো সমৃদ্ধ। তবে আজ পর্যন্ত কেন ওহাবি মাদ্রাসার কোনো শিক্ষার্থী এসব ভাষার সাহিত্যের মর্মমধু আত্মস্থ করে সাহিত্য রচনা করলেন না? নজরুলের মতো 'অঞ্জলী লহো মোর সংগীতে'র মতো গানও লিখলেন না। নিদেনপক্ষে বাংলা ভাষার কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধে আরবি ফার্সির যুৎসই প্রয়োগ তো ঘটাতে পারতেন। কেন ওহাবি মাদ্রাসার একজন শিক্ষার্থীকেও আমরা ফেরদৌসী, সাদী, হাফিজ বা মির্জা গালিবের ভূমিকায় দেখলাম না। তাহলে অন্তত পাঠ্যবইয়ে ওহাবি শিক্ষায় শিক্ষিত সাহিত্যিকদের কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ পাঠ্যবইয়ে সংযোজন করা যেত। বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা একজন কাশীরাম দাস বা বাল্মিকীকে পায়নি। আলাওল ও দৌলত উজির, তালিকা এ দুইয়ে এসে শেষ হয়ে যায়। ইসলামের ইতিহাস নিয়ে মুসলমান লেখকদের পঠন প্রতুলতা কি কম? ধর্মকি কাব্য রচনার ঔচিত্যবোধে বাধা? এসব বলা বা বিচারের অধিকার আছে কিনা জানিনা। তবে ঠিক যে ইতিহাসের দীর্ঘ সময় উপমহাদেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বী সাহিত্যিকরা স্পষ্ট চিন্তার বদলে আবেগকে প্রাধান্য দেয়ায় তাদের শিল্পদৃষ্টি অস্পষ্ট থেকে গেছে। অথবা সেমিটিক ধর্ম হিসেবে ইসলামে পারলৌকিক জীবনকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়ায় ভাষাবোধ রুগ্ন করতে দেরি হয়ে গেছে তাদের। জানি এ মতের বিপক্ষে বহুমাত্রিক বয়ান আছে। সুলতানি আমলে মুসলমান শাসকদের বাংলা ভাষায় পৃষ্ঠপোষকতার প্রসঙ্গ আসবে, আবদুল হাকিমের 'যেসব বঙ্গেতে জন্মি, হিংসে বঙ্গবাণী'র উদ্ধৃতি টেনে বলা হবে বাংলা ভাষার প্রতি মুসলমান লেখকের ভালোবাসার কথা। তবে ভুলে যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না, 'সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি' উচ্চারণের মাধ্যমে আবদুল হাকিম স্বজাতির লেখকদের প্রতি তীব্র ক্ষোভই প্রকাশ করেছেন।

মানছি, বাংলা ভাষা ও বাংলাসাহিত্যের বিকাশ হয়েছে উচ্চবর্ণের হিন্দুসাহিত্যিকদের হাতে; কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দু সাহিত্যিকের হাতে যদি উচ্চরসের সাহিত্য সৃষ্টি হয় সেই সাহিত্যের রস থেকে বাংলাসাহিত্যের পাঠকদের বঞ্চিত করা ঠিক হবে? লেখকের আবার জাত কী, এ সরল উক্তি আজকের জটিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কাছে পাত্তা পাবে না জেনে আগের বাক্যটি লিখলাম। আরবি, ফার্সি, এমনকি উর্দুর প্রতিও বিদ্বেষ থাকার কথা নয় কারও, ভাষার নিজের অপরাধ কী? যে কোনো ভাষাই পরিপূর্ণ আত্মস্থ করতে পারলে এবং তাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে সাহিত্যে প্রয়োগ করতে পারলে পাঠ্য বিষয় সরস হবে, ভাষা প্রাণ পাবে, ইসলামিক রচনা বলে চাপিয়ে দেয়ার প্রশ্ন উঠবে না। পাঠ্যবইয়ে হযরত মোহাম্মদ (সা.), খলিফা আবু বকর (রা.), খলিফা ওমর (রা.), বিদায় হজ এবং শহীদ তিতুমীরকে নিয়ে লেখায় ভাষার অসরসতা এবং সাহিত্যবোধ নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে সেই প্রশ্নকে কেবল 'গণমানুষের প্রত্যাশা'র বিরোধিতা বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। ধর্ম, ভাষা, রাজনীতি এসবের গভীরে যত প্রবেশ করা যায়, সেগুলো ততই দূরবর্তী বিষয় হয়ে ওঠে। আপাতত বঙ্কিমের ভাষা ধার করে বলি— এ বড় কঠিন রাজচক্র, এর মর্ম ভেদ করা বড়ই কঠিন।

জয়া ফারহানা : *গল্পকার ও প্রাবন্ধিক*